Sibani Mandal Mahavidyalaya

CC-7

Bangla Katha Sahitya

কপালকুণ্ডলা — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

“কপালকুণ্ডলা” — সংক্ষেপ

“কপালকুণ্ডলা” বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এক অন্যতম রোমান্টিক ও ট্র্যাজিক উপন্যাস। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র কপালকুণ্ডলা—যে প্রকৃতির কোলে, সমাজ ও সভ্যতার বাইরে বড় হয়ে ওঠে। অরণ্য, নদী ও পাহাড়ই তার জগৎ; সামাজিক রীতি-নীতি, সংসারজীবন তার কাছে অপরিচিত।

নবকুমার এক দুর্ঘটনাবশত অরণ্যে এসে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে পরিচিত হন। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু বিবাহের পর কপালকুণ্ডলা যখন সভ্য সমাজে প্রবেশ করে, তখনই তার জীবনে সংকট শুরু হয়। সমাজের নিয়ম, পারিবারিক শৃঙ্খলা ও নারীর প্রত্যাশিত আচরণ সে গ্রহণ করতে পারে না।

প্রকৃতির মুক্ত জীবন ও সমাজের বন্ধন—এই দ্বন্দ্ব কপালকুণ্ডলার মনে গভীর মানসিক যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। সে নবকুমারকে ভালোবাসলেও সামাজিক জীবনে নিজেকে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। এই দ্বন্দ্বই শেষ পর্যন্ত তার জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্টিক প্রেম, প্রকৃতিপ্রেম ও মানবিক আবেগের সঙ্গে সমাজবাস্তবতার সংঘাত তুলে ধরেছেন। *“কপালকুণ্ডলা”* কেবল একটি প্রেমকাহিনি নয়, বরং প্রকৃতি ও সভ্যতার সংঘর্ষে মানবমনের দুর্বলতার এক গভীর সাহিত্যিক প্রকাশ।

এক লাইনের সারকথা:

☞ *“কপালকুণ্ডলা” প্রকৃতি ও সভ্যতার দ্বন্দ্বে আবদ্ধ এক রোমান্টিক-ট্র্যাজিক মানবকাহিনি।*

কপালকুণ্ডলা — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বোধমূলক প্রশ্ন (২টি)

1. কপালকুণ্ডলা কোন পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে এবং সেই পরিবেশ তার চরিত্রে কী প্রভাব ফেলে?
2. নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার পরিচয় কীভাবে ঘটে?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (২টি)

1. কপালকুণ্ডলার চরিত্রে প্রকৃতি ও সভ্যতার দ্বন্দ্ব কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে—ব্যাখ্যা করো।
2. ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে রোমান্টিকতা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণ আলোচনা করো।

পদ্মানদীর মাঝি — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

“পদ্মানদীর মাঝি” — বিস্তারিত সারসংক্ষেপ

“পদ্মানদীর মাঝি” মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাস্তববাদী উপন্যাস, যেখানে বাংলার নদীঘেরা দরিদ্র জেলে সমাজের জীবনসংগ্রাম অত্যন্ত নির্মম ও সত্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়েছে। উপন্যাসের পটভূমি পদ্মানদীর তীরবর্তী কেতুপুর গ্রাম।

কাহিনির সূচনা ও পরিবেশ

কেতুপুর একটি দরিদ্র জেলে গ্রাম, যেখানে মানুষের জীবন ও জীবিকা সম্পূর্ণভাবে পদ্মানদীর ওপর নির্ভরশীল। নদী কখনো তাদের জীবনের ভরসা, আবার কখনো সর্বনাশের কারণ। বন্যা, ভাঙন, ঝড় ও অনিশ্চয়তা—সব মিলিয়ে মানুষের জীবন সর্বদা বিপন্ন।

কুবেরের জীবন

উপন্যাসের প্রধান চরিত্র কুবের। সে একজন দরিদ্র জেলে, যে কঠোর পরিশ্রম করেও দারিদ্র্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারে না। স্ত্রী মালতী, সন্তান ও পরিবারের দায়িত্ব তার কাঁধে। দারিদ্র্য, অসুস্থতা ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা কুবেরের জীবনের প্রধান সংকট।

মানুষে-মানুষে সম্পর্ক

গ্রামের মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা থাকলেও জীবনের কঠিন বাস্তবতা তাদের সম্পর্ককে জটিল করে তোলে। হোসেন মিয়া, গোপাল, কপিলা প্রমুখ চরিত্রের মাধ্যমে লেখক

মানুষের কামনা, লোভ, দুর্বলতা ও মানবিকতার নানা দিক তুলে ধরেছেন। কপিলার সঙ্গে কুবেরের সম্পর্ক উপন্যাসে এক সূক্ষ্ম মানসিক টানাপোড়েন সৃষ্টি করে।

নদীর ভূমিকা

পদ্মা নদী এই উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। নদী জেলেদের জীবিকা দেয়, আবার হঠাৎ করেই ভাঙন ও বন্যার মাধ্যমে তাদের ঘরবাড়ি, জীবন ও স্বপ্ন ধ্বংস করে দেয়। নদী যেন মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে—কে বাঁচবে, কে মরবে, কে গ্রাম ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে।

দারিদ্র্য ও শোষণ

উপন্যাসে দরিদ্র জেলেদের ওপর সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শোষণ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। শ্রমের যথাযথ মূল্য তারা পায় না। অসুখ, অভাব ও অনাহার তাদের নিত্যসঙ্গী। তবুও তারা জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা হারায় না।

শেষ পরিণতি

ক্রমশ পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যেখানে কুবের ও তার পরিবারকে গ্রাম ছেড়ে নতুন জীবনের সন্ধানে বেরোতে হয়। এই প্রস্থান কোনো বিজয় নয়, বরং বেঁচে থাকার এক নিরুপায় চেষ্টা। উপন্যাসের শেষ অংশে মানুষের অসহায়তা ও ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা গভীরভাবে প্রকাশ পায়।

উপন্যাসের মূল ভাব ও তাৎপর্য

- নদী-নির্ভর মানুষের জীবনসংগ্রাম
- দারিদ্র্য ও সামাজিক শোষণ
- মানবিক সম্পর্কের জটিলতা
- প্রকৃতির কাছে মানুষের অসহায়তা

এক লাইনের সারকথা (পরীক্ষার জন্য):

☞ *“পদ্মানদীর মাঝি” নদীঘেরা দরিদ্র মানুষের জীবনের কঠোর বাস্তবতা ও অবিরাম সংগ্রামের এক মর্মস্পর্শী দলিল।*

বোধমূলক প্রশ্ন (২টি)

1. কুবের কী পেশায় নিয়োজিত এবং তার জীবনের প্রধান সংকট কী?
2. কেতুপুর গ্রাম ও পদ্মানদীর পরিবেশ কীভাবে উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে?

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (২টি)

1. ‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে নদী কীভাবে মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে—ব্যাখ্যা করো।
2. কুবেরের চরিত্রের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবনসংগ্রাম কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে—বিশদে আলোচনা করো।

□ কপালকুণ্ডলা — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বোধমূলক প্রশ্ন–১ (৫ নম্বর)

প্রশ্ন:

কপালকুণ্ডলা কোন পরিবেশে বড় হয়ে ওঠে এবং সেই পরিবেশ তার চরিত্রে কী প্রভাব ফেলে?

উত্তর:

কপালকুণ্ডলা গভীর অরণ্য ও প্রকৃতির কোলে বড় হয়ে ওঠে। সংসারজীবন, সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। এই প্রকৃতিনির্ভর পরিবেশ তাকে সহজ, নিষ্পাপ, স্বাধীনচেতা ও সাহসী করে তোলে। তবে একই সঙ্গে সে সামাজিক রীতিনীতি ও পারিবারিক আচরণ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থেকে যায়। ফলে পরবর্তীকালে সভ্য সমাজে এসে সে মানিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়। এইভাবে তার বেড়ে ওঠার পরিবেশ তার চরিত্রে সরলতা ও বন্যতার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে।

বোধমূলক প্রশ্ন–২ (৫ নম্বর)

প্রশ্ন:

নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার পরিচয় কীভাবে ঘটে?

উত্তর:

নবকুমার এক দুর্ঘটনাবশত অরণ্যের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেন। সেখানে তিনি কপালকুণ্ডলার সঙ্গে প্রথমবারের মতো সাক্ষাৎ করেন। কপালকুণ্ডলা তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে ও আশ্রয় দেয়। এই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতেই দুজনের পরিচয় ঘটে এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে বিশ্বাস ও স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–১ (১৫ নম্বর)

প্রশ্ন:

কপালকুণ্ডলার চরিত্রে প্রকৃতি ও সভ্যতার দ্বন্দ্ব কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে—ব্যাখ্যা করো।

উত্তর:

‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃতি ও সভ্যতার দ্বন্দ্বকে কপালকুণ্ডলার চরিত্রের মাধ্যমে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতির সন্তান—অরণ্য, নদী ও পাহাড়ই তার প্রকৃত বাসস্থান। সেখানে সে স্বাধীন, নির্ভীক ও স্বতঃস্ফূর্ত।

কিন্তু নবকুমারের সঙ্গে বিবাহের পর যখন সে সমাজবদ্ধ সভ্য জীবনে প্রবেশ করে, তখনই দ্বন্দ্ব শুরু হয়। সামাজিক নিয়ম, পারিবারিক দায়িত্ব ও নারীসুলভ আচরণ তার কাছে অপরিচিত ও বেদনাদায়ক মনে হয়। সে প্রকৃতির মুক্ত জীবন ছেড়ে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে না।

এই দ্বন্দ্বই তার মানসিক যন্ত্রণার মূল কারণ হয়ে ওঠে। প্রকৃতি যেখানে তাকে মুক্তি দেয়, সভ্যতা সেখানে তাকে শৃঙ্খলিত করে। শেষ পর্যন্ত এই দ্বন্দ্ব তার জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতি ডেকে আনে। এইভাবেই কপালকুণ্ডলার চরিত্রে প্রকৃতি ও সভ্যতার সংঘর্ষ স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–২ (১৫ নম্বর)

প্রশ্ন:

‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে রোমান্টিকতা ও বাস্তবতার সংমিশ্রণ আলোচনা করো।

উত্তর:

‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্টিক কল্পনা ও বাস্তব জীবনের কঠোর সত্যকে দক্ষতার সঙ্গে মিলিয়েছেন। কপালকুণ্ডলার অরণ্যজীবন, তার সৌন্দর্য, প্রেম ও আত্মত্যাগ উপন্যাসে এক রোমান্টিক আবহ সৃষ্টি করে। প্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক এক ধরনের কাব্যিক রূপ ধারণ করেছে।

অন্যদিকে, উপন্যাসে সমাজ, ধর্মীয় গোঁড়ামি, নারীর অবস্থান ও সামাজিক বিধিনিষেধ বাস্তবতার কঠিন রূপে উপস্থিত। কপালকুণ্ডলা এই বাস্তব সমাজে টিকে থাকতে পারে না। রোমান্টিক প্রেম বাস্তব জীবনের দায়িত্বের কাছে পরাজিত হয়।

এই রোমান্টিকতা ও বাস্তবতার সংঘাতই উপন্যাসের মূল ট্র্যাজিক সুর তৈরি করে। ফলে ‘কপালকুণ্ডলা’ কেবল একটি প্রেমকাহিনি নয়, বরং সামাজিক বাস্তবতারও প্রতিফলন।

পদ্মানদীর মাঝি — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

বোধমূলক প্রশ্ন–১ (৫ নম্বর)

প্রশ্ন:

কুবের কী পেশায় নিয়োজিত এবং তার জীবনের প্রধান সংকট কী?

উত্তর:

কুবের একজন দরিদ্র জেলে। সে পদ্মা নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। তার জীবনের প্রধান সংকট হলো চরম দারিদ্র্য, অনিশ্চিত জীবন ও পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব। নদীর ওপর নির্ভরশীল জীবন তাকে প্রতিনিয়ত বিপদের মুখোমুখি করে তোলে।

বোধমূলক প্রশ্ন–২ (৫ নম্বর)

প্রশ্ন:

কেতুপুর গ্রাম ও পদ্মানদীর পরিবেশ কীভাবে উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে?

উত্তর:

কেতুপুর গ্রাম পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত একটি দরিদ্র জেলে গ্রাম। এখানে মানুষের জীবন নদীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। নদী কখনো জীবিকার উৎস, কখনো ধ্বংসের কারণ। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই পরিবেশকে অত্যন্ত বাস্তব ও জীবন্তভাবে উপস্থাপন করেছেন।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–১ (১৫ নম্বর)

প্রশ্ন:

‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে নদী কীভাবে মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে—ব্যাখ্যা করো।

উত্তর:

‘পদ্মানদীর মাঝি’ উপন্যাসে পদ্মা নদী কেবল একটি প্রাকৃতিক উপাদান নয়, বরং মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রক শক্তি। নদী জেলেদের জীবিকা দেয়, আবার হঠাৎ বন্যা ও ভাঙনের মাধ্যমে তাদের সর্বস্ব কেড়ে নেয়।

কুবের ও তার মতো জেলেদের জীবন সম্পূর্ণভাবে নদীর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। নদীর শান্তি মানে জীবন, আর নদীর রুদ্ররূপ মানে মৃত্যু ও সর্বনাশ। এই অনিশ্চয়তাই জেলেদের জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য।

নদী মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে—কে বাঁচবে, কে মরবে, কে গ্রাম ছেড়ে যাবে। এইভাবে নদী উপন্যাসে এক নিয়ন্ত্রক ও নিয়তি-সদৃশ শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–২ (১৫ নম্বর)

প্রশ্ন:

কুবেরের চরিত্রের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জীবনসংগ্রাম কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে—বিশদে আলোচনা করো।

উত্তর:

কুবেরের চরিত্রের মধ্য দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের করুণ জীবনসংগ্রাম তুলে ধরেছেন। কুবের কঠোর পরিশ্রমী হলেও দারিদ্র্যের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারে না। তার শ্রমের বিনিময়ে সে নিরাপত্তা বা স্থায়িত্ব পায় না।

পরিবারের দায়িত্ব, স্ত্রীর অসুস্থতা ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ—সব মিলিয়ে কুবের এক অবিরাম সংগ্রামের মধ্যে দিন কাটায়। সমাজব্যবস্থায় তার কোনো নিরাপত্তা নেই। তবুও সে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করে যায়।

কুবেরের জীবনের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন যে দরিদ্র মানুষের সংগ্রাম শুধু অর্থনৈতিক নয়, মানসিক ও সামাজিকও। এইভাবেই কুবের গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের প্রতীক হয়ে ওঠে।

“দেনা–পাওনা” — বিস্তারিত সারসংক্ষেপ

“দেনা–পাওনা” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সমাজবাস্তবধর্মী ছোটগল্প, যেখানে তৎকালীন সমাজে **পণপ্রথা**, **নারীর অবমাননা** এবং **মানবিক মূল্যবোধের সংকট** তীক্ষ্ণভাবে উন্মোচিত হয়েছে।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র **নির্মলা**—একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। নির্মলার বিয়ে হয় **রামকানাই**–এর সঙ্গে। বিয়ের সময় নির্মলার পরিবার সামর্থ্য অনুযায়ী উপঢৌকন দিলেও শ্বশুরবাড়ির প্রত্যাশা ছিল আরও বেশি। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়িতে ‘দেনা–পাওনা’র হিসাব শুরু হয়—নির্মলা যেন মানুষ নয়, বরং দেনা আদায়ের মাধ্যম।

শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ক্রমাগত নির্মলার বাবার কাছে অর্থ ও সম্পদের দাবি জানাতে থাকে। দাবিগুলি পূরণ না হওয়ায় নির্মলাকে নানা অপমান, মানসিক নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হতে হয়। স্বামী রামকানাই দুর্বল চরিত্রের; সে পরিবারের অন্য সদস্যদের অন্যায় দাবির বিরোধিতা করতে পারে না। ফলে নির্মলা সম্পূর্ণভাবে অসহায় হয়ে পড়ে।

এদিকে নির্মলার বাবা দারিদ্র্যের কারণে শ্বশুরবাড়ির দাবি পূরণে অক্ষম। তবু মেয়ের সুখের আশায় তিনি শেষ চেষ্টা চালান। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির লোভ ও নিষ্ঠুরতার শেষ নেই। ধীরে ধীরে নির্মলার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা ভেঙে পড়ে।

গল্পের পরিণতি অত্যন্ত মর্মান্তিক। নির্মলার মৃত্যু সমাজের এই অমানবিক ব্যবস্থার নির্মম ফলাফল হিসেবে উপস্থিত হয়। মৃত্যুর পরও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা ‘দেনা–পাওনা’র হিসাব নিয়ে ব্যস্ত থাকে—যা তাদের চরম নিষ্ঠুরতা ও মানবতাহীনতাকে স্পষ্ট করে তোলে।

এই গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, **পণপ্রথা শুধু একটি সামাজিক কুপ্রথা নয়—এটি নারীর জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনে**। ‘দেনা–পাওনা’ কেবল অর্থনৈতিক লেনদেনের গল্প নয়; এটি মানুষের মূল্যবোধের দেনা–পাওনার গল্প।

গল্পের মূল বিষয় ও তাৎপর্য

- পণপ্রথার নিষ্ঠুরতা
- নারীর সামাজিক অসহায়তা
- দাম্পত্য জীবনে মানবিকতার অভাব
- লোভ ও অর্থকেন্দ্রিক মানসিকতার সমালোচনা

এক লাইনের সারকথা (পরীক্ষার জন্য):

☞ *“দেনা–পাওনা” পণপ্রথা ও মানবতাহীন সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ।*

বোধমূলক প্রশ্ন–১

প্রশ্ন:

নির্মলার শ্বশুরবাড়িতে প্রধান সমস্যার উৎস কী ছিল?

উত্তর (৫ নম্বর):

নির্মলার শ্বশুরবাড়িতে প্রধান সমস্যার উৎস ছিল **পণ বা দেনা–পাওনার লোভ**। বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নির্মলার বাবার কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ ও সম্পদের দাবি জানাতে থাকে। এই দাবি পূরণ না হওয়ায় নির্মলাকে অবহেলা, অপমান ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। ফলে সংসারজীবনে তার সুখ নষ্ট হয়।

বোধমূলক প্রশ্ন–২

প্রশ্ন:

রামকানাইয়ের চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করো।

উত্তর (৫ নম্বর):

রামকানাইয়ের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো **দুর্বলতা ও সিদ্ধান্তহীনতা**। সে স্ত্রী নির্মলার প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও শ্বশুরবাড়ির অন্য সদস্যদের অন্যায় দাবির বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে পারে না। এই দুর্বলতাই নির্মলার দুর্দশা আরও বাড়িয়ে তোলে।

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (১৫ নম্বর × ২)

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–১

প্রশ্ন:

‘দেনা–পাওনা’ গল্পে পণপ্রথার নিষ্ঠুর রূপ কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে—ব্যাখ্যা করো।

উত্তর (১৫ নম্বর):

‘দেনা–পাওনা’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পণপ্রথার নিষ্ঠুর ও অমানবিক রূপকে অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরেছেন। নির্মলার বিয়ের সময় তার পরিবার সামর্থ্য অনুযায়ী উপঢৌকন দিলেও শ্বশুরবাড়ির লোভের শেষ হয় না। বিয়ের পর থেকেই নির্মলার পরিবারকে দেনা–পাওনার হিসাবের মধ্যে ফেলা হয়।

শ্বশুরবাড়ির লোকেরা নির্মলাকে একজন মানুষ হিসেবে না দেখে অর্থ আদায়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। দাবিগুলি পূরণ না হওয়ায় নির্মলাকে মানসিক নির্যাতন, অবহেলা ও অপমান সহ্য করতে হয়। স্বামীর দুর্বলতা ও সমাজের নীরব সমর্থনে এই নির্যাতন আরও বেড়ে যায়।

গল্পের মর্মান্তিক পরিণতিতে নির্মলার মৃত্যু প্রমাণ করে যে পণপ্রথা শুধু সামাজিক কুপ্রথা নয়, এটি নারীর জীবন ধ্বংসকারী এক নিষ্ঠুর ব্যবস্থা। এইভাবে গল্পে পণপ্রথার ভয়াবহতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–২

প্রশ্ন:

‘দেনা–পাওনা’ গল্পে নির্মলার চরিত্রের ট্র্যাজিক দিকটি বিশ্লেষণ করো।

উত্তর (১৫ নম্বর):

নির্মলা ‘দেনা–পাওনা’ গল্পের এক ট্র্যাজিক চরিত্র। সে শান্ত, সহনশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হলেও সমাজ ও পরিবার তাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। শ্বশুরবাড়িতে সে ভালোবাসা ও সম্মান পাওয়ার পরিবর্তে লোভের শিকার হয়।

নির্মলার ট্র্যাজেডির মূল কারণ তার ব্যক্তিগত কোনো দোষ নয়, বরং সমাজব্যবস্থার নিষ্ঠুরতা। সে প্রতিবাদ করতে শেখেনি, সব অন্যায় নীরবে সহ্য করেছে। স্বামী রামকানাইয়ের দুর্বলতা ও বাবার অসহায়তা তাকে আরও একা করে তোলে।

শেষ পর্যন্ত নির্মলার মৃত্যু সমাজের এই অমানবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নীরব প্রতিবাদ হয়ে ওঠে। তার জীবন ও মৃত্যু পাঠকের মনে গভীর বেদনাবোধ জাগায়। এইভাবেই নির্মলা একটি করুণ ও ট্র্যাজিক চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

“মেঘ ও রৌদ্র” — বিস্তারিত সারসংক্ষেপ

“মেঘ ও রৌদ্র” একটি মানবিক ও বাস্তবধর্মী ছোটগল্প, যেখানে মানুষের জীবনের **দুঃখ–কষ্ট (মেঘ)** ও **আশা–আনন্দ (রৌদ্র)**–এর সহাবস্থানকে সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয়েছে। গল্পের পটভূমিতে গ্রামীণ জীবন, প্রকৃতি ও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সংগ্রাম বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

গল্পে দেখা যায়, প্রকৃতির পরিবর্তনশীল রূপ মানুষের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। কখনো আকাশে মেঘ জমে ওঠে—যেমন মানুষের জীবনে আসে দুঃখ, অভাব ও হতাশা; আবার কখনো রৌদ্র উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—যেমন জীবনে আসে স্বস্তি, আশা ও নতুন সম্ভাবনা। এই প্রকৃতিগত রূপান্তর মানুষের মানসিক অবস্থার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

কাহিনির চরিত্ররা সাধারণ মানুষ—যারা দারিদ্র্য, অনিশ্চয়তা ও সামাজিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। জীবনের কঠিন সময়ে তারা ভেঙে পড়লেও সম্পূর্ণভাবে হাল ছেড়ে দেয় না। দুঃখের মধ্যেও তারা আনন্দের ক্ষুদ্র মুহূর্ত খুঁজে পায়—পরিবারের টান, প্রকৃতির সৌন্দর্য, কিংবা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ক্ষীণ আশা।

গল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো—জীবন কখনোই একরৈখিক নয়। মেঘের পর যেমন রৌদ্র আসে, তেমনি দুঃখের পরেও সুখের সম্ভাবনা থাকে। লেখক দেখিয়েছেন, মানুষের সহনশীলতা ও জীবনীশক্তিই তাকে প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করতে সাহায্য করে। প্রকৃতি এখানে শুধু পটভূমি নয়, বরং মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি।

গল্পের পরিণতিতে কোনো নাটকীয় সমাধান নেই; বরং জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহই মুখ্য। পাঠক উপলব্ধি করে যে **মেঘ ও রৌদ্র—উভয়ই জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ**, আর এই দুইয়ের মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে।

গল্পের মূল ভাব ও তাৎপর্য

- দুঃখ ও সুখের সহাবস্থান
- প্রকৃতি ও মানবজীবনের সাদৃশ্য
- সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রাম
- আশা ও সহনশীলতার গুরুত্ব

বোধমূলক প্রশ্ন–১

প্রশ্ন:

‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পে “মেঘ” ও “রৌদ্র” কোন কোন মানবিক অবস্থার প্রতীক?

উত্তর (৫ নম্বর):

গল্পে “মেঘ” মানুষের জীবনের দুঃখ, কষ্ট, হতাশা ও অনিশ্চয়তার প্রতীক। অন্যদিকে “রৌদ্র” আশাবাদ, আনন্দ, স্বস্তি ও নতুন সম্ভাবনার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকৃতির এই দুই রূপের মাধ্যমে লেখক মানুষের জীবনের সুখ–দুঃখের পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনকে বোঝাতে চেয়েছেন।

বোধমূলক প্রশ্ন–২

প্রশ্ন:

গল্পে প্রকৃতির ভূমিকা কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে?

উত্তর (৫ নম্বর):

গল্পে প্রকৃতি কেবল পটভূমি নয়, বরং মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি হিসেবে উপস্থিত। আকাশের মেঘ জমা বা রৌদ্রের উজ্জ্বলতা মানুষের মানসিক অবস্থার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রকৃতি মানুষের অনুভূতিকে প্রকাশের মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (১৫ নম্বর × ২)

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–১

প্রশ্ন:

‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পে জীবনের দুঃখ–সুখের সহাবস্থানের ধারণা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে—বিশদে আলোচনা করো।

উত্তর (১৫ নম্বর):

‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পে লেখক দেখিয়েছেন যে মানুষের জীবন কখনো একমাত্রিক নয়; এখানে দুঃখ ও সুখ পাশাপাশি অবস্থান করে। মেঘ যেমন আকাশকে আচ্ছন্ন করে অন্ধকার আনে, তেমনি মানুষের জীবনে আসে দুঃখ, অভাব ও হতাশা। কিন্তু সেই অন্ধকার দীর্ঘস্থায়ী নয়—মেঘ কেটে গেলে রৌদ্রের আবির্ভাব ঘটে।

গল্পের চরিত্ররা কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হলেও সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে না। দুঃখের মধ্যেও তারা ক্ষুদ্র সুখের মুহূর্ত খুঁজে পায়—পরিবারের টান, প্রকৃতির সৌন্দর্য কিংবা আগামী দিনের আশা। এইভাবেই গল্পে দুঃখ–সুখের সহাবস্থান মানবজীবনের স্বাভাবিক নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

লেখক পাঠককে বোঝাতে চান যে জীবনের সংকটই শেষ কথা নয়; তার পরেও আলো আসতে পারে। এই আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিই গল্পের মূল শক্তি।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–২

প্রশ্ন:

‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পে প্রকৃতি ও মানবজীবনের সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করো।

উত্তর (১৫ নম্বর):

গল্পে প্রকৃতি ও মানবজীবনের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতির পরিবর্তনশীল রূপ—মেঘের আনাগোনা ও রৌদ্রের উদ্ভাস—মানুষের জীবনের উত্থান–পতনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যেমন প্রকৃতিতে ঝড়, বৃষ্টি ও অন্ধকারের পর শান্তি ও আলো ফিরে আসে, তেমনি মানুষের জীবনেও দুঃখের পর সুখের সম্ভাবনা থাকে।

লেখক প্রকৃতিকে মানুষের অনুভূতির ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ফলে পাঠক সহজেই চরিত্রগুলোর মানসিক অবস্থার সঙ্গে একাত্ম হতে পারে। এই সাদৃশ্য গল্পটিকে গভীর অর্থবহ ও সংবেদনশীল করে তুলেছে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রকৃতি ও মানবজীবনের এই সমান্তরাল উপস্থাপনাই ‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পের শিল্পমূল্য ও ভাবগত গভীরতা বৃদ্ধি করেছে।

“মণিহারা” — বিস্তারিত সারসংক্ষেপ

“মণিহারা” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রতীকধর্মী ও মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্প, যেখানে **লোভ, দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন, অপরাধবোধ ও আত্মবিনাশ**—এই বিষয়গুলি গভীরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। গল্পটির পটভূমি এক নিঃসঙ্গ নদীতীরবর্তী বাড়ি, যা রহস্য ও ভৌতিক আবহ সৃষ্টি করে।

গল্পের প্রধান চরিত্র **গিরিবালা**—এক সুন্দরী, বিলাসপ্রিয় ও আত্মকেন্দ্রিক নারী। তার স্বামী **ফণিভূষণ** একজন ধনী ব্যবসায়ী, যিনি কর্মসূত্রে প্রায়ই বাইরে থাকেন। দাম্পত্য সম্পর্কে ভালোবাসার উষ্ণতা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব ধীরে ধীরে প্রকট হয়ে ওঠে। গিরিবালা স্বামীর প্রতি অনুরাগের চেয়ে নিজের অলংকার ও ঐশ্বর্যকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

ফণিভূষণের দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগে গিরিবালার চরিত্রে লোভ ও সন্দেহ প্রবল হয়। সে স্বামীর সম্পদ ও গহনার ওপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। একসময় গিরিবালা তার সমস্ত মূল্যবান গয়না গোপনে নিয়ে স্বামীর বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এই ঘটনায় দাম্পত্য সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে।

পরবর্তীকালে গিরিবালা এক অজানা নদীতীরবর্তী বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সেখানে সে একাকিত্ব, ভয় ও অপরাধবোধে ধীরে ধীরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। গল্পে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে তার মানসিক যন্ত্রণা ও লোভের ফলেই তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যুর পর সে যেন ভূত হয়ে সেই বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়—তার হারানো মণি বা গয়নার সন্ধানে।

গল্পের শেষ অংশে ফণিভূষণ সেই পরিত্যক্ত বাড়িতে এসে গিরিবালার উপস্থিতি অনুভব করেন। গিরিবালার আত্মা গয়নার প্রতি তার অদম্য লোভের প্রতীক হয়ে ওঠে। সে জীবদ্দশায় যেমন মণির মোহে আবদ্ধ ছিল, মৃত্যুর পরেও সেই মোহ তাকে মুক্তি দেয় না।

এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন—**মানুষ যখন ভালোবাসা ও মানবিক সম্পর্ককে ত্যাগ করে সম্পদের মোহে আবদ্ধ হয়, তখন তার পরিণতি হয় আত্মিক শূন্যতা ও ধ্বংস**। ‘মণিহারা’ কেবল একটি ভৌতিক গল্প নয়; এটি মানুষের অন্তর্গত লোভ ও অপরাধবোধের প্রতীকী উপস্থাপনা।

গল্পের মূল বিষয় ও তাৎপর্য

- লোভ ও সম্পদের মোহ
- দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন
- অপরাধবোধ ও মানসিক সংকট
- আত্মিক মুক্তির অভাব

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–১

প্রশ্ন:

‘মণিহারা’ গল্পে লোভ ও সম্পদের মোহ কীভাবে মানুষের আত্মিক পতনের কারণ হয়ে উঠেছে—বিশদে আলোচনা করো।

উত্তর (১৫ নম্বর):

‘মণিহারা’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোভ ও সম্পদের মোহকে মানুষের আত্মিক পতনের মূল কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন। গিরিবালা ধনী স্বামীর সংসারে থেকেও মানসিক তৃপ্তি পায় না। তার সমস্ত আকর্ষণ কেন্দ্রীভূত থাকে গয়না ও সম্পদের ওপর। এই লোভ ধীরে ধীরে তার মানবিক অনুভূতিকে গ্রাস করে।

গিরিবালা স্বামীর অনুপস্থিতিতে গোপনে সমস্ত গয়না নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এই কাজ তার নৈতিক পতনের স্পষ্ট নিদর্শন। পরবর্তীকালে নিঃসঙ্গ নদীতীরবর্তী বাড়িতে সে ভয়, অপরাধবোধ ও মানসিক অস্থিরতায় ভেঙে পড়ে। মৃত্যুর পরেও সে গয়নার মোহ থেকে মুক্তি পায় না—ভূতের রূপে ফিরে আসে ‘মণি’র সন্ধানে।

এইভাবে গল্পে দেখানো হয়েছে যে সম্পদের মোহ মানুষকে কেবল সামাজিকভাবে নয়, আত্মিকভাবেও ধ্বংস করে।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–২

প্রশ্ন:

‘মণিহারা’ গল্পে ভৌতিক আবহের আড়ালে যে মনস্তাত্ত্বিক সত্য লুকিয়ে আছে তা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর (১৫ নম্বর):

‘মণিহারা’ আপাতদৃষ্টিতে একটি ভৌতিক গল্প হলেও এর গভীরে রয়েছে গভীর মনস্তাত্ত্বিক সত্য। নদীতীরবর্তী নির্জন বাড়ি, রাতের নিস্তব্ধতা ও অদৃশ্য উপস্থিতি—এসব উপাদান গল্পে ভয়ের আবহ সৃষ্টি করে। কিন্তু এই ভয় আসলে গিরিবালার অপরাধবোধ ও মানসিক অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ।

গিরিবালা জীবদ্দশায় যে অন্যায় করেছে—স্বামীকে ত্যাগ করে গয়না নিয়ে পালানো—তার জন্য সে মানসিক শান্তি পায় না। এই অপরাধবোধই মৃত্যুর পর ভৌতিক উপস্থিতির রূপ নেয়। রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখিয়েছেন যে প্রকৃত ভয় অতিপ্রাকৃত নয়, বরং মানুষের নিজের মনেই নিহিত।

অতএব, ভৌতিক আবহের আড়ালে ‘মণিহারা’ মানুষের লোভ, অপরাধবোধ ও আত্মিক শূন্যতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

“নিশীথে” — বিস্তারিত সারসংক্ষেপ

“নিশীথে” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও প্রতীকধর্মী ছোটগল্প। গল্পটির কেন্দ্রে রয়েছে **অপরাধবোধ, আত্মসংঘাত, ভয় ও মানবমনের অন্ধকার দিক**। ‘নিশীথ’ অর্থাৎ গভীর মধ্যরাত—এই সময়টিই গল্পের প্রতীকী পটভূমি, যেখানে মানুষের অবচেতনের অন্ধকার দিক উন্মোচিত হয়।

গল্পের প্রধান চরিত্র একজন শিক্ষিত, ভদ্র ও সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি। বাহ্যিকভাবে তার জীবন সুশৃঙ্খল হলেও অন্তরে সে এক গভীর মানসিক সংকটে ভুগছে। অতীতে করা একটি গুরুতর অপরাধ বা অন্যায় কাজ তার মনে স্থায়ী অপরাধবোধের জন্ম দিয়েছে। দিনের আলোয় সে নিজেকে স্বাভাবিক ও সংযত রাখতে পারলেও, রাতের নিস্তব্ধতায় সেই অপরাধবোধ তীব্র হয়ে ওঠে।

নিশীথ রাতে চারপাশের নিস্তব্ধতা, অন্ধকার ও একাকিত্ব তার মনে ভয় ও বিভ্রম সৃষ্টি করে। সে মনে করতে থাকে—কেউ যেন তাকে লক্ষ্য করছে, কেউ যেন তার অপরাধ জেনে ফেলেছে। বাস্তবে কোনো বাহ্যিক বিপদ না থাকলেও, তার নিজের মনই হয়ে ওঠে তার সবচেয়ে বড় শত্রু। অতীতের স্মৃতি ও অপরাধবোধ তার চিন্তাকে ক্রমাগত আচ্ছন্ন করে ফেলে।

গল্পে কোনো দৃশ্যমান শাস্তি বা সামাজিক প্রতিশোধ নেই; কিন্তু মানসিক যন্ত্রণাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে কঠোর শাস্তি। নিশীথের অন্ধকারে চরিত্রটি নিজের সত্যিকারের মুখোমুখি হয়। সে উপলব্ধি করে যে অপরাধ গোপন করা গেলেও অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।

গল্পের শেষদিকে কোনো নাটকীয় ঘটনা ঘটে না। বরং পাঠক বুঝতে পারে—এই মানসিক দহনই তার জীবনের স্থায়ী বাস্তবতা। ‘নিশীথে’ তাই কেবল একটি ভৌতিক বা রহস্যময় গল্প নয়; এটি মানুষের বিবেক, নৈতিকতা ও আত্মসংঘাতের এক গভীর সাহিত্যিক অনুসন্ধান।

গল্পের মূল বিষয় ও তাৎপর্য

- অপরাধবোধ ও আত্মগ্লানি
- মানবমনের অবচেতন ভয়

- রাত ও অন্ধকারের প্রতীকী ব্যবহার
- নৈতিকতার মনস্তাত্ত্বিক শাস্তি

এক লাইনের সারকথা (পরীক্ষার জন্য):

☞ *“নিশীথে” মানুষের অপরাধবোধ ও আত্মসংঘাতের অন্ধকার মনস্তত্ত্বের এক গভীর সাহিত্যিক প্রকাশ।*

বোধমূলক প্রশ্ন–১

প্রশ্ন:

‘নিশীথে’ গল্পে ‘নিশীথ’ শব্দটির তাৎপর্য কী?

উত্তর (৫ নম্বর):

‘নিশীথ’ অর্থ গভীর মধ্যরাত। গল্পে এই সময়টি মানুষের অবচেতনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। দিনের আলোয় যে অপরাধবোধ চাপা থাকে, নিশীথের নিস্তব্ধ অন্ধকারে তা তীব্র হয়ে ওঠে। ফলে ‘নিশীথ’ মানবমনের অন্ধকার দিক ও আত্মসংঘাতের প্রতীক।

বোধমূলক প্রশ্ন–২

প্রশ্ন:

গল্পের প্রধান চরিত্রের ভয়ের মূল উৎস কী?

উত্তর (৫ নম্বর):

গল্পের প্রধান চরিত্রের ভয়ের মূল উৎস কোনো বাহ্যিক বিপদ নয়, বরং তার **নিজের অপরাধবোধ**। অতীতে করা অন্যায় কাজের স্মৃতি তাকে তাড়া করে বেড়ায়। নিশীথের নীরবতায় সেই অপরাধবোধ বিভ্রম ও আতঙ্কের রূপ নেয়।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (১৫ নম্বর × ২)

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–১

প্রশ্ন:

‘নিশীথে’ গল্পে অপরাধবোধ কীভাবে মানুষের মানসিক শাস্তিতে পরিণত হয়েছে—বিশদে আলোচনা করো।

উত্তর (১৫ নম্বর):

‘নিশীথে’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ অপরাধবোধকে মানুষের অন্তর্গত ও সবচেয়ে কঠোর শাস্তি হিসেবে দেখিয়েছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র সামাজিকভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত হয় না; আইন বা সমাজ তাকে দণ্ডিত করে না। কিন্তু তার অন্তরে জন্ম নেওয়া অপরাধবোধ তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না।

দিনের বেলায় সে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে পারলেও নিশীথের অন্ধকারে তার বিবেক জেগে ওঠে। চারপাশের নিস্তব্ধতা তার মনে বিভ্রম সৃষ্টি করে—সে মনে করে কেউ তাকে দেখছে, তার অপরাধ প্রকাশ পেয়ে যাবে। এই মানসিক যন্ত্রণা ক্রমে ভয় ও আতঙ্কে পরিণত হয়।

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, বাহ্যিক শাস্তি এড়ানো গেলেও অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। এই মানসিক দহনই চরিত্রটির প্রকৃত শাস্তি হয়ে ওঠে।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–২

প্রশ্ন:

‘নিশীথে’ গল্পে অন্ধকার ও নিস্তব্ধতার প্রতীকী ব্যবহার বিশ্লেষণ করো।

উত্তর (১৫ নম্বর):

‘নিশীথে’ গল্পে অন্ধকার ও নিস্তব্ধতা কেবল পরিবেশ রচনার উপাদান নয়; এগুলি গভীর প্রতীকী তাৎপর্য বহন করে। নিশীথের অন্ধকার মানুষের অবচেতন মন ও গোপন অপরাধের প্রতীক। দিনের কোলাহল যেখানে সত্যকে আড়াল করে, নিশীথের নীরবতা সেখানে আত্মসমালোচনার সুযোগ এনে দেয়।

নিস্তব্ধ পরিবেশে প্রধান চরিত্র নিজের চিন্তার মুখোমুখি হয়। বাইরের কোনো শব্দ না থাকায় তার মনের আওয়াজ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই অন্ধকার ও নীরবতাই তার ভয় ও বিভ্রমকে তীব্র করে তোলে।

এই প্রতীকী ব্যবহারের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন—মানুষের প্রকৃত বিচারক হলো তার নিজের বিবেক। নিশীথের অন্ধকার সেই বিচারপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্র তৈরি করে।

“এক রাত্রি” — বিস্তারিত সারসংক্ষেপ

“এক রাত্রি” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক ছোটগল্প, যেখানে **মানবমনের অন্তর্দ্বন্দ্ব, নৈতিকতা, অপরাধবোধ ও আত্মোপলব্ধি**—এই বিষয়গুলি এক রাতের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে উন্মোচিত হয়েছে। গল্পের নামের মতোই ‘এক রাত্রি’ এখানে কেবল সময়ের নির্দেশক নয়, বরং মানুষের জীবনের একটি **সংকটময় মানসিক পর্যায়ের প্রতীক**।

গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে একজন শিক্ষিত, সমাজে প্রতিষ্ঠিত পুরুষ চরিত্র। বাহ্যিকভাবে তার জীবন স্বাভাবিক ও সুশৃঙ্খল হলেও অন্তরে সে গভীর অস্থিরতা ও নৈতিক সংকটে ভুগছে। এক বিশেষ রাতে ঘটে যাওয়া একটি ঘটনা—বা সেই ঘটনার স্মৃতি—তার মনে প্রবল আলোড়ন তোলে। এই রাতেই তার গোপন কামনা, দ্বিধা, ভয় ও অপরাধবোধ একসঙ্গে মাথা তুলে দাঁড়ায়।

রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশে চরিত্রটি নিজের চিন্তার মুখোমুখি হয়। দিনের আলোয় যে সামাজিক মুখোশ সে পরে থাকে, সেই মুখোশ এক রাত্রিতে খসে পড়ে। সে উপলব্ধি করে যে মানুষের আসল সংগ্রাম বাইরের জগতের সঙ্গে নয়, বরং নিজের বিবেকের সঙ্গে। এই এক রাতের অভিজ্ঞতা তার মানসিক জগৎকে আমূল নাড়া দেয়।

গল্পে কোনো বড় বাহ্যিক ঘটনা বা নাটকীয় মোড় নেই; বরং ভেতরের মানসিক টানাপোড়েনই মূল কাহিনি। চরিত্রটি নিজের কামনা ও নৈতিকতার মধ্যে দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়। সে বুঝতে পারে—একটি মুহূর্তের ভুল বা দুর্বলতা সারাজীবনের অপরাধবোধে পরিণত হতে পারে।

শেষ পর্যন্ত ‘এক রাত্রি’ চরিত্রটির জীবনে একটি **আত্মজাগরণের মুহূর্ত** হয়ে ওঠে। এই রাত তাকে শিক্ষা দেয় যে মানুষের জীবনে সত্যিকার বিচারক হলো তার নিজের বিবেক। সামাজিক চোখ এড়ানো গেলেও আত্মবিচার থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না।

এই গল্পের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন—মানুষের জীবনে একটি মাত্র রাতও তার চিন্তা, মূল্যবোধ ও আত্মপরিচয়কে বদলে দিতে পারে। *“এক রাত্রি”* তাই সময়ের গল্প নয়, **মানবমনের গভীরতম সংকটের গল্প**।

গল্পের মূল বিষয় ও তাৎপর্য

- মানবমনের অন্তর্দ্বন্দ্ব
- নৈতিকতা বনাম কামনা
- অপরাধবোধ ও আত্মবিচার
- রাতের প্রতীকী ব্যবহার

এক লাইনের সারকথা (পরীক্ষার জন্য):

☞ *“এক রাত্রি” মানুষের জীবনে একটি সংকটময় মুহূর্তে বিবেক ও আত্মোপলব্ধির গভীর মনস্তাত্ত্বিক কাহিনি।*

বোধমূলক প্রশ্ন–১

প্রশ্ন:

‘এক রাত্রি’ গল্পে “রাত্রি” শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

উত্তর (৫ নম্বর):

‘এক রাত্রি’ গল্পে “রাত্রি” কেবল সময়ের নির্দেশক নয়; এটি মানুষের জীবনের একটি **সংকটময় মানসিক অবস্থার প্রতীক**। এই রাত্রিতেই প্রধান চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, অপরাধবোধ ও নৈতিক প্রশ্নগুলি তীব্র হয়ে ওঠে। ফলে “রাত্রি” আত্মসমীক্ষা ও আত্মোপলব্ধির সময় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

বোধমূলক প্রশ্ন–২

প্রশ্ন:

গল্পে প্রধান চরিত্রের মানসিক অস্থিরতার মূল কারণ কী?

উত্তর (৫ নম্বর):

গল্পে প্রধান চরিত্রের মানসিক অস্থিরতার মূল কারণ হলো তার **নৈতিক দ্বন্দ্ব ও অপরাধবোধ**। সামাজিকভাবে সে সম্মানিত হলেও অন্তরে সে নিজের কামনা ও বিবেকের সংঘর্ষে ভুগছে। এই দ্বন্দ্বই তাকে গভীর মানসিক অস্থিরতার মধ্যে ফেলে।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (১৫ নম্বর × ২)

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–১

প্রশ্ন:

‘এক রাত্রি’ গল্পে মানবমনের অন্তর্দ্বন্দ্ব কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে—বিশদে আলোচনা করো।

উত্তর (১৫ নম্বর):

‘এক রাত্রি’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ মানবমনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। গল্পের প্রধান চরিত্র বাহ্যিকভাবে সামাজিক নিয়ম মেনে চললেও অন্তরে সে নিজের কামনা ও নৈতিকতার মধ্যে দ্বন্দ্বে জর্জরিত। দিনের আলোয় সে এই দ্বন্দ্ব আড়াল করতে পারলেও রাত্রির নিস্তব্ধতায় তা প্রবল হয়ে ওঠে।

এই এক রাত্রিতে চরিত্রটি নিজের আসল সত্তার মুখোমুখি হয়। সামাজিক মুখোশ খুলে পড়ে এবং সে উপলব্ধি করে যে মানুষের প্রকৃত সংগ্রাম বাহ্যিক নয়, বরং নিজের বিবেকের সঙ্গে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বই গল্পের মূল চালিকাশক্তি।

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে এই মানসিক সংঘর্ষ মানুষকে আত্মসমালোচনার পথে নিয়ে যায় এবং নৈতিক পরিপক্কতার সুযোগ তৈরি করে।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–২

প্রশ্ন:

‘এক রাত্রি’ গল্পে অপরাধবোধ ও আত্মোপলব্ধির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

উত্তর (১৫ নম্বর):

‘এক রাত্রি’ গল্পে অপরাধবোধ মানুষের আত্মোপলব্ধির প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। প্রধান চরিত্র কোনো সামাজিক শাস্তির মুখোমুখি না হলেও তার অন্তরের অপরাধবোধ তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। এই অপরাধবোধই তাকে নিজের কাজ ও মানসিক দুর্বলতা নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে।

এই এক রাতের চিন্তা ও আত্মসংঘাতের মধ্য দিয়ে সে উপলব্ধি করে যে সামাজিক বিচার এড়ানো গেলেও আত্মবিচার এড়ানো যায় না। এই উপলব্ধিই তাকে নৈতিকভাবে আরও সচেতন করে তোলে।

অতএব, গল্পে অপরাধবোধ কোনো নেতিবাচক অনুভূতি নয়; বরং এটি আত্মশুদ্ধি ও আত্মজাগরণের পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেছে।

“শুভা” — বিস্তারিত সারসংক্ষেপ

“শুভা” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল ও মানবতাবাদী ছোটগল্প, যেখানে **নীরবতার ভাষা, সমাজের নিষ্ঠুরতা, প্রতিবন্ধী মানুষের অন্তর্জগত এবং নিঃসঙ্গতা** গভীরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র **শুভা**, যে জন্মগতভাবে **বোবা (মূক)**।

শুভা কথা বলতে পারে না, ফলে সমাজ তাকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে ব্যর্থ হয়। তার বাবা-মা শুভাকে ভালোবাসলেও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর উদ্বেগে থাকেন। শুভার মনের কথা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম তার চোখ, মুখভঙ্গি ও প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক। নদী, গাছ, পাখি ও প্রকৃতি যেন শুভার নীরব সঙ্গী।

গ্রামের মানুষ শুভাকে করুণার চোখে দেখে, আবার অনেকেই তাকে বোঝা মনে করে। সমাজ তার নীরবতাকে দুর্বলতা হিসেবে গণ্য করে। শুভা নিজের সীমাবদ্ধতা বুঝতে পারে, কিন্তু তার অনুভূতি গভীর ও তীব্র। সে অনুভব করে ভালোবাসা, লজ্জা ও কষ্ট—সবই, কিন্তু ভাষার অভাবে তা প্রকাশ করতে পারে না।

গল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে শুভার বিয়ের প্রসঙ্গ ওঠে। সমাজ ও পরিবার তার মতামত না নিয়েই বিয়ের ব্যবস্থা করে। বিয়ের সময় শুভার বোবা পরিচয় গোপন রাখা হয়। কিন্তু বিয়ের পর সত্য প্রকাশ পেলে শ্বশুরবাড়িতে সে অবহেলার শিকার হয়। তার স্বামী শুভার নীরবতাকে গ্রহণ করতে পারে না।

এই প্রত্যাখ্যান শুভার জীবনে গভীর ট্র্যাজেডি ডেকে আনে। সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। গল্পের শেষে শুভার অন্তর্লীন যন্ত্রণা পাঠকের হৃদয়ে গভীর বেদনার সঞ্চার করে। কোনো উচ্চকিত প্রতিবাদ নয়—নীরবতাই হয়ে ওঠে শুভার সবচেয়ে শক্তিশালী ভাষা।

রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে দেখিয়েছেন, **সমাজ শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে ক্ষমা করে না**, অথচ প্রকৃতি সেই মানুষকেই নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করে। *“শুভা”* মূলত মানুষের মানবিক ব্যর্থতার এক করুণ দলিল।

গল্পের মূল বিষয় ও তাৎপর্য

- প্রতিবন্ধী মানুষের অন্তর্জগত
- নীরবতার ভাষা ও অনুভূতি
- সামাজিক নিষ্ঠুরতা ও অবহেলা
- মানবিক সহানুভূতির অভাব

এক লাইনের সারকথা (পরীক্ষার জন্য):

☞ *“শুভা” নীরবতার মধ্য দিয়ে এক প্রতিবন্ধী নারীর গভীর মানবিক যন্ত্রণার মর্মস্পর্শী কাহিনি।*

বোধমূলক প্রশ্ন–১

প্রশ্ন:

শুভা কেন কথা বলতে পারে না এবং তার এই নীরবতা কীভাবে তার জীবনে প্রভাব ফেলেছে?

উত্তর (৫ নম্বর):

শুভা জন্মগতভাবে বোবা, তাই সে কথা বলতে পারে না। এই নীরবতার কারণে সমাজ ও পরিবারের অনেকেই তার অনুভূতি বুঝতে ব্যর্থ হয়। ভাষার অভাবে সে নিজের আনন্দ, কষ্ট ও ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারে না, ফলে তার জীবন নিঃসঙ্গতা ও অবহেলায় ভরে ওঠে।

বোধমূলক প্রশ্ন–২

প্রশ্ন:

গল্পে প্রকৃতির সঙ্গে শুভার সম্পর্ক কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে?

উত্তর (৫ নম্বর):

গল্পে প্রকৃতি শুভার নীরব সঙ্গী হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। গাছ, নদী ও পাখির সঙ্গে শুভার এক গভীর আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রকৃতি তাকে বিচার করে না, বরং নিঃশর্তভাবে গ্রহণ করে—যা মানবসমাজের বিপরীত চিত্র।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (১৫ নম্বর × ২)

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–১

প্রশ্ন:

‘শুভা’ গল্পে নীরবতা কীভাবে ভাষার বিকল্প হয়ে উঠেছে—বিশদে আলোচনা করো।

উত্তর (১৫ নম্বর):

‘শুভা’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ নীরবতাকে একটি শক্তিশালী ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। শুভা কথা বলতে না পারলেও তার চোখের দৃষ্টি, মুখভঙ্গি ও আচরণের মধ্য দিয়ে তার গভীর অনুভূতি প্রকাশ পায়। এই নীরব ভাষা অনেক সময় কথার চেয়েও বেশি অর্থবহ হয়ে ওঠে।

সমাজ যদিও নীরবতাকে দুর্বলতা মনে করে, লেখক দেখিয়েছেন যে শুভার অনুভূতি অন্যদের চেয়ে কম নয়। বরং ভাষার অভাব তাকে আরও সংবেদনশীল করে তুলেছে। তার নীরবতাই সমাজের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে এক নীরব প্রতিবাদ হয়ে দাঁড়ায়।

এইভাবে গল্পে নীরবতা কেবল সীমাবদ্ধতা নয়, বরং এক গভীর মানবিক ভাষার রূপ ধারণ করেছে।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–২

প্রশ্ন:

‘শুভা’ গল্পে সমাজের মানবিক ব্যর্থতা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে—বিশ্লেষণ করো।

উত্তর (১৫ নম্বর):

‘শুভা’ গল্পে সমাজের মানবিক ব্যর্থতা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। শুভা প্রতিবন্ধী হওয়ায় সমাজ তাকে করুণার চোখে দেখে, কিন্তু তাকে বোঝার চেষ্টা করে না। তার মতামত বা অনুভূতির কোনো মূল্য দেওয়া হয় না।

বিয়ের ক্ষেত্রে শুভার ইচ্ছা উপেক্ষা করা হয় এবং তার বোবা পরিচয় গোপন রেখে বিয়ে দেওয়া হয়। সত্য প্রকাশ পাওয়ার পর শ্বশুরবাড়ির প্রত্যাখ্যান সমাজের নিষ্ঠুরতার চরম উদাহরণ। এই আচরণ প্রমাণ করে, সমাজ ভিন্নতাকে গ্রহণ করতে ব্যর্থ।

রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে দেখিয়েছেন যে প্রকৃত প্রতিবন্ধকতা শরীরে নয়, বরং মানুষের মানসিক সংকীর্ণতায় নিহিত। এই মানবিক ব্যর্থতাই শুভার জীবনের ট্র্যাজেডির মূল কারণ।

“অতিথি” — বিস্তারিত সারসংক্ষেপ

“অতিথি” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ছোটগল্প, যেখানে **স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, গৃহবন্দিত্বের বিরোধ, মানবমনের চঞ্চলতা এবং সামাজিক প্রত্যাশার সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সংঘাত** অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র **তারাপদ**—একজন চঞ্চল, স্বাধীনচেতা কিশোর।

তারাপদ ছোটবেলা থেকেই ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে। কোথাও স্থায়ীভাবে বাঁধা পড়া তার স্বভাবের বিরুদ্ধে। একসময় সে জমিদার **মতিলালবাবুর** বাড়িতে এসে আশ্রয় নেয়। মতিলালবাবু ও তাঁর স্ত্রী তারাপদকে স্নেহে গ্রহণ করেন। তারা তাকে পড়াশোনা শেখান, ভালো পোশাক দেন এবং পরিবারের সদস্যের মতো আগলে রাখেন। ধীরে ধীরে তারাপদের জীবনে স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তা আসে।

কিন্তু এই আরামদায়ক জীবনই তারাপদের মনে এক ধরনের অস্বস্তি সৃষ্টি করে। মুক্ত আকাশ, অজানা পথ ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ডাক তার হৃদয়ে প্রবল হয়ে ওঠে। এদিকে মতিলালবাবু তারাপদের জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করেন—পড়াশোনা, চাকরি এমনকি বিয়ের কথাও ভাবা হয়। সমাজের চোখে এটি তারাপদের জন্য “সুযোগ”, কিন্তু তারাপদের কাছে তা এক ধরনের শৃঙ্খল।

মতিলালবাবুর কন্যা **চারুলতা** (বা কুমুদিনী—পাঠভেদে নামের ভিন্নতা দেখা যায়)–এর সঙ্গে তারাপদের এক নীরব স্নেহের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্ক তারাপদকে আরও দৃঢ়ভাবে সংসারজীবনের বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে বলে মনে হয়। কিন্তু তারাপদের মন এতে শান্তি খুঁজে পায় না। সে অনুভব করে—এই স্থায়ী জীবনে সে নিজের সত্তা হারিয়ে ফেলবে।

শেষ পর্যন্ত একদিন কোনো কথা না বলে, কোনো বিদায় না জানিয়ে তারাপদ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। তার এই প্রস্থান আকস্মিক হলেও তার চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে আবার অজানা পথের যাত্রী হয়ে ওঠে—একজন চিরকালীন “অতিথি”, যে কোথাও স্থায়ী নয়।

গল্পের শেষে পাঠক উপলব্ধি করে—তারাপদের এই চলে যাওয়া কৃতজ্ঞতার অভাব নয়, বরং তার স্বাধীনচেতা স্বভাবের অনিবার্য প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে দেখিয়েছেন, **সব মানুষের জীবনের লক্ষ্য এক নয়; কারও কাছে নিরাপত্তা বড়, আবার কারও কাছে স্বাধীনতাই সর্বোচ্চ মূল্য**।

গল্পের মূল বিষয় ও তাৎপর্য

- ব্যক্তিস্বাধীনতা বনাম সামাজিক বন্ধন
- চঞ্চল মানবমনের প্রকৃতি
- গৃহস্থালি জীবনের সীমাবদ্ধতা
- ‘অতিথি’ হিসেবে মানুষের অস্থায়িত্ব

এক লাইনের সারকথা (পরীক্ষার জন্য):

☞ *“অতিথি” স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় গৃহ ও সমাজের বন্ধন ছিন্ন করা এক চঞ্চল মানবমনের গভীর মানবিক কাহিনি।*

বোধমূলক প্রশ্ন–১

প্রশ্ন:

তারাপদ কেন মতিলালবাবুর বাড়ি ছেড়ে চলে যায়?

উত্তর (৫ নম্বর):

তারাপদ মতিলালবাবুর বাড়ি ছেড়ে চলে যায় কারণ সে স্থায়ী ও বাঁধাধরা গৃহস্থালি জীবনে নিজেকে বন্দি মনে করে। আরাম, নিরাপত্তা ও সামাজিক পরিকল্পনা তার স্বাধীনচেতা স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মুক্ত পথে ঘুরে বেড়ানোর আকাঙ্ক্ষাই তাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করে।

বোধমূলক প্রশ্ন–২

প্রশ্ন:

গল্পে মতিলালবাবুর ভূমিকা কী?

উত্তর (৫ নম্বর):

মতিলালবাবু গল্পে এক স্নেহশীল ও দায়িত্ববান অভিভাবক চরিত্র। তিনি তারাপদকে আশ্রয় দেন, পড়াশোনা ও নিরাপদ ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করতে চান। তার চরিত্রের মাধ্যমে সমাজের স্থায়িত্বপ্রিয় ও নিরাপত্তামুখী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে।

● ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (১৫ নম্বর × ২)

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–১

প্রশ্ন:

‘অতিথি’ গল্পে তারাপদের চরিত্রের মাধ্যমে ব্যক্তিস্বাধীনতার ধারণা কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে—বিশদে আলোচনা করো।

উত্তর (১৫ নম্বর):

‘অতিথি’ গল্পে তারাপদের চরিত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতীক। সে স্বভাবগতভাবেই চঞ্চল ও মুক্তচেতা। কোথাও স্থায়ীভাবে বাঁধা পড়া তার কাছে অসহনীয়। মতিলালবাবুর বাড়িতে সে ভালোবাসা ও নিরাপত্তা পেলেও তার মন মুক্ত আকাশ ও অজানা পথের দিকে টানে।

সমাজ তারাপদের জন্য যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করে—পড়াশোনা, চাকরি ও বিয়ে—সবই তার কাছে শৃঙ্খল বলে মনে হয়। সে উপলব্ধি করে যে এই পথে চললে নিজের সত্তা হারাবে। তাই সে কোনো অভিযোগ বা বিদ্রোহ ছাড়াই নীরবে চলে যায়।

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, ব্যক্তিস্বাধীনতা মানুষের মৌলিক প্রয়োজন; তা দমন করলে মানুষ স্থবির ও অসুখী হয়ে পড়ে। তারাপদের প্রস্থান এই সত্যেরই শিল্পিত প্রকাশ।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–২

প্রশ্ন:

‘অতিথি’ গল্পে ‘অতিথি’ শব্দটির প্রতীকী তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

উত্তর (১৫ নম্বর):

‘অতিথি’ গল্পে ‘অতিথি’ শব্দটি প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তারাপদ কেবল মতিলালবাবুর বাড়ির অতিথি নয়, সে জীবনের প্রতিটি স্থায়ী কাঠামোরই অতিথি। কোথাও স্থায়ীভাবে থাকার মানসিকতা তার নেই।

রবীন্দ্রনাথ এই শব্দের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে কিছু মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অস্থায়ী যাত্রী। তারা সমাজের গড়া স্থায়িত্বে আবদ্ধ হতে পারে না। এই ‘অতিথি’ মনোভাবই তারাপদের চরিত্রের মূল সত্তা।

অতএব, ‘অতিথি’ গল্পটি মানুষের স্বাধীনতা ও জীবনের অস্থায়িত্ব নিয়ে এক গভীর দার্শনিক বক্তব্য তুলে ধরে।

“ল্যাবরেটরি” — বিস্তারিত সারসংক্ষেপ

“ল্যাবরেটরি” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি ব্যতিক্রমধর্মী ও আধুনিক মননের ছোটগল্প, যেখানে **বিজ্ঞান, মানবিকতা, নারীর স্বাধীনতা, নৈতিক দ্বন্দ্ব এবং আত্মত্যাগ**—এই বিষয়গুলি গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র **সোহিনী (বা সোহিনী দেবী)**—একজন শিক্ষিত, স্বাধীনচেতা ও দৃঢ়চরিত্র নারী।

সোহিনী একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ এবং একটি গবেষণাগারের (ল্যাবরেটরি) সঙ্গে যুক্ত। তার জীবন ও চিন্তাধারা প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি থেকে ভিন্ন। সে বিশ্বাস করে যুক্তি, পরীক্ষা ও বাস্তবতার ওপর। আবেগ বা সামাজিক সংস্কারের চাপে সে সিদ্ধান্ত নেয় না। এই কারণেই সমাজ তাকে অনেক সময় কঠোর ও অমানবিক বলে মনে করে।

গল্পে দেখা যায়, সোহিনীর পুত্র (বা সন্তানতুল্য একজন যুবক—পাঠভেদে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়) গুরুতর অসুস্থ। তার জীবন বাঁচানোর একমাত্র উপায় হলো একটি নতুন ও ঝুঁকিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বা পরীক্ষা, যা এখনো সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষিত নয়। এই পরীক্ষাটি সফল হলে বহু মানুষের উপকার হতে পারে, কিন্তু ব্যর্থ হলে নিশ্চিত মৃত্যু।

এই পরিস্থিতিতে সোহিনীর সামনে এক ভয়াবহ নৈতিক সংকট উপস্থিত হয়। একদিকে সে একজন মা—সন্তানের জীবন রক্ষা তার কাছে সবচেয়ে মূল্যবান। অন্যদিকে সে একজন বিজ্ঞানী—যার কাছে সত্য ও জ্ঞান মানবকল্যাণের বৃহত্তর উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত। সে উপলব্ধি করে যে ব্যক্তিগত আবেগের কারণে যদি সে সত্যের পথ থেকে সরে যায়, তবে বিজ্ঞান ও মানবজাতির প্রতি সে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

দীর্ঘ মানসিক সংগ্রামের পর সোহিনী কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সে ব্যক্তিগত মাতৃত্ববোধকে দমন করে বৈজ্ঞানিক নীতির পথে অটল থাকে। এই সিদ্ধান্ত তার কাছে নিষ্ঠুর হলেও, সে জানে—এটাই বৃহত্তর সত্য ও মানবকল্যাণের পথ।

গল্পের পরিণতি করুণ ও গভীরভাবে ভাবনাজাগানিয়া। সোহিনী তার ব্যক্তিগত সুখ বিসর্জন দেয়, কিন্তু তার আত্মত্যাগ বিজ্ঞান ও মানবসভ্যতার অগ্রগতির প্রতীক হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখিয়েছেন—আধুনিক যুগে মানবিকতা কেবল আবেগনির্ভর নয়; কখনো কখনো তা কঠোর নৈতিক সাহসের দাবি করে।

"ল্যাবরেটরি" গল্পটি তাই কেবল বিজ্ঞান বনাম আবেগের দ্বন্দ্ব নয়; এটি **মানুষের নৈতিক উচ্চতা, নারীর স্বাধীন সিদ্ধান্তক্ষমতা এবং আধুনিক মননের এক শক্তিশালী সাহিত্যিক প্রকাশ**।

গল্পের মূল বিষয় ও তাৎপর্য

- বিজ্ঞান ও মানবিকতার দ্বন্দ্ব
- মাতৃত্ব বনাম নৈতিক দায়িত্ব
- নারীর স্বাধীনতা ও দৃঢ়তা
- আত্মত্যাগ ও মানবকল্যাণ

এক লাইনের সারকথা (পরীক্ষার জন্য):

☞ *"ল্যাবরেটরি" বিজ্ঞান ও মানবিকতার সংঘাতে এক নারীর কঠিন নৈতিক সিদ্ধান্তের গভীর মানবিক কাহিনি।*

বোধমূলক প্রশ্ন–১

প্রশ্ন:

সোহিনীর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী?

উত্তর (৫ নম্বর):

সোহিনীর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার **বিজ্ঞানমনস্কতা ও দৃঢ় নৈতিক সাহস**। তিনি আবেগের পরিবর্তে যুক্তি ও সত্যকে গুরুত্ব দেন। সামাজিক সমালোচনা বা ব্যক্তিগত কষ্ট সত্ত্বেও তিনি নিজের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন, যা তাকে একটি শক্তিশালী ও স্বাধীনচেতা চরিত্রে পরিণত করেছে।

বোধমূলক প্রশ্ন–২

প্রশ্ন:

‘ল্যাবরেটরি’ গল্পে ল্যাবরেটরির ভূমিকা কী?

উত্তর (৫ নম্বর):

গল্পে ল্যাবরেটরি কেবল একটি গবেষণাগার নয়; এটি **বিজ্ঞান, যুক্তি ও নৈতিক পরীক্ষার প্রতীক**। এখানেই সোহিনীর জীবনের সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তের জন্ম হয়। ল্যাবরেটরি মানুষের আবেগ ও যুক্তির সংঘাতের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন (১৫ নম্বর × ২)

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–১

প্রশ্ন:

‘ল্যাবরেটরি’ গল্পে বিজ্ঞান ও মানবিকতার দ্বন্দ্ব কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে—বিশদে আলোচনা করো।

উত্তর (১৫ নম্বর):

‘ল্যাবরেটরি’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান ও মানবিকতার দ্বন্দ্বকে অত্যন্ত গভীরভাবে তুলে ধরেছেন। সোহিনী একদিকে একজন মা, অন্যদিকে একজন বিজ্ঞানী। একজন মা হিসেবে সন্তানের জীবন রক্ষা করা তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কিন্তু বিজ্ঞানী হিসেবে সে জানে—অপরীক্ষিত আবেগের কারণে সত্যের পথ থেকে সরে যাওয়া অনৈতিক।

তার সন্তানের চিকিৎসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে এই দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছায়। পরীক্ষাটি ঝুঁকিপূর্ণ হলেও ভবিষ্যৎ মানবকল্যাণের সম্ভাবনা বহন করে। সোহিনী ব্যক্তিগত কষ্ট সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক নীতির সঙ্গে আপস করেন না।

এই সিদ্ধান্ত মানবিকতার পরিপন্থী মনে হলেও রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন—কখনো কখনো মানবকল্যাণের বৃহত্তর স্বার্থে কঠোর সিদ্ধান্তই প্রকৃত মানবিকতা। এই দ্বন্দ্বই গল্পটির মূল দার্শনিক শক্তি।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্ন–২

প্রশ্ন:

‘ল্যাবরেটরি’ গল্পে সোহিনীর চরিত্রের মাধ্যমে নারীর স্বাধীনতা ও আত্মত্যাগ কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে—বিশ্লেষণ করো।

উত্তর (১৫ নম্বর):

‘ল্যাবরেটরি’ গল্পে সোহিনী আধুনিক, স্বাধীনচেতা নারীর প্রতীক। তিনি সমাজনির্ধারিত আবেগপ্রবণ মাতৃত্বের গণ্ডিতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন না। নিজের বুদ্ধি, বিবেক ও নৈতিকতার ভিত্তিতে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

তার আত্মত্যাগ প্রচলিত অর্থে আত্মবিসর্জন নয়; এটি সচেতন ও যুক্তিনির্ভর আত্মত্যাগ। তিনি ব্যক্তিগত সুখ বিসর্জন দিয়ে মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেন। এই সিদ্ধান্ত নারীর দুর্বলতার নয়, বরং তার শক্তি ও স্বাধীনতার পরিচয় বহন করে।

রবীন্দ্রনাথ এই চরিত্রের মাধ্যমে দেখিয়েছেন—নারীর স্বাধীনতা মানে আবেগত্যাগ নয়, বরং **নৈতিক সাহস ও আত্মনির্ভর সিদ্ধান্তক্ষমতা**।

নিচে **কপালকুণ্ডলা থেকে ল্যাবরেটরি পর্যন্ত ১০টি রচনা** থেকে
☞ **মোট ১০০টি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন–উত্তর (১ নম্বর করে)**
☞ **প্রতিটি রচনা থেকে ঠিক ১০টি করে প্রশ্ন**

---

১. কপালকুণ্ডলা — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১০টি)

1. কপালকুণ্ডলার রচয়িতা কে?
   উ: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
2. কপালকুণ্ডলা কোন পরিবেশে বড় হয়?
   উ: অরণ্য পরিবেশে।
3. কপালকুণ্ডলার স্বভাব কেমন?
   উ: স্বাধীনচেতা ও সরল।
4. নবকুমার কীভাবে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে পরিচিত হয়?
   উ: দুর্ঘটনাবশত অরণ্যে এসে।
5. কপালকুণ্ডলার জীবনের প্রধান দ্বন্দ্ব কী?
   উ: প্রকৃতি ও সভ্যতার দ্বন্দ্ব।
6. উপন্যাসটির প্রকৃতি কেমন?
   উ: রোমান্টিক-ট্র্যাজিক।
7. কপালকুণ্ডলা কেন সমাজে মানিয়ে নিতে পারে না?
   উ: সামাজিক রীতির সঙ্গে অপরিচয়ের কারণে।
8. কপালকুণ্ডলার জীবন কোন শক্তির প্রতীক?
   উ: প্রকৃতির স্বাধীনতার।
9. কপালকুণ্ডলার চরিত্রে কোন ভাব প্রধান?
   উ: স্বাভাবিকতা।
10. কপালকুণ্ডলা কী ধরনের উপন্যাস?
    উ: রোমান্টিক উপন্যাস।

---

২. পদ্মানদীর মাঝি — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১০টি)

11. উপন্যাসটির রচয়িতা কে?
    উ: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
12. প্রধান চরিত্রের নাম কী?
    উ: কুবের।

13. কুবেরের পেশা কী?
উ: জেলে।
14. উপন্যাসের পটভূমি কোথায়?
উ: পদ্মানদীর তীরবর্তী গ্রাম।
15. পদ্মা নদী কীসের প্রতীক?
উ: নিয়তি ও জীবিকা।
16. কুবের কোন শ্রেণির প্রতিনিধি?
উ: দরিদ্র শ্রমজীবী।
17. উপন্যাসটি কোন ধারার?
উ: বাস্তববাদী।
18. গ্রামটির নাম কী?
উ: কেতুপুর।
19. উপন্যাসে প্রধান সমস্যা কী?
উ: দারিদ্র্য।
20. পদ্মানদীর ভূমিকা কেমন?
উ: নিয়ন্ত্রক শক্তি।

---

৩. দেনা–পাওনা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১০টি)

21. গল্পটির রচয়িতা কে?
উ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
22. গল্পের নায়িকার নাম কী?
উ: নির্মলা।
23. গল্পে কোন কুপ্রথার সমালোচনা হয়েছে?
উ: পণপ্রথা।
24. নির্মলার স্বামীর নাম কী?
উ: রামকানাই।
25. নির্মলার প্রধান দুর্ভোগের কারণ কী?
উ: শ্বশুরবাড়ির লোভ।
26. রামকানাইয়ের চরিত্র কেমন?
উ: দুর্বল।
27. গল্পের প্রকৃতি কেমন?
উ: সমাজবাস্তবধর্মী।
28. নির্মলার পরিণতি কী?
উ: মর্মান্তিক মৃত্যু।
29. গল্পে মানবিকতার অভাব কোথায়?
উ: শ্বশুরবাড়িতে।

30. গল্পের মূল বার্তা কী?
উ: পণপ্রথার নিষ্ঠুরতা।

---

৪. মেঘ ও রৌদ্র (১০টি)

31. “মেঘ” কীসের প্রতীক?
উ: দুঃখ।
32. “রৌদ্র” কীসের প্রতীক?
উ: আশা।
33. গল্পের মূল বিষয় কী?
উ: দুঃখ–সুখের সহাবস্থান।
34. প্রকৃতি এখানে কী রূপে এসেছে?
উ: প্রতীক হিসেবে।
35. গল্পটি কোন ধরনের?
উ: প্রতীকধর্মী।
36. মেঘের পর কী আসে?
উ: রৌদ্র।
37. গল্পে আশাবাদের স্থান কী?
উ: গুরুত্বপূর্ণ।
38. গল্পের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন?
উ: মানবিক।
39. প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্ক কী?
উ: সমান্তরাল।
40. গল্পের বার্তা কী?
উ: জীবন পরিবর্তনশীল।

---

৫. মণিহারা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১০টি)

41. গল্পটির প্রধান নারী চরিত্র কে?
উ: গিরিবালা।
42. গিরিবালার স্বামীর নাম কী?
উ: ফণিভূষণ।
43. গিরিবালার প্রধান আসক্তি কী?
উ: অলংকার।
44. গল্পে কোন মানসিক বিষয় প্রধান?
উ: লোভ।

45. গল্পের আবহ কেমন?
উ: রহস্যময়।
46. গিরিবালা কোথায় আশ্রয় নেয়?
উ: নদীতীরবর্তী বাড়িতে।
47. গল্পে ভৌতিকতা কীসের প্রতীক?
উ: অপরাধবোধ।
48. গিরিবালার পরিণতি কী?
উ: আত্মিক ধ্বংস।
49. গল্পের মূল ভাব কী?
উ: সম্পদমোহের সর্বনাশ।
50. ‘মণিহারা’ শব্দের অর্থ কী?
উ: গয়নাহারা।

---

৬. নিশীথে — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১০টি)

51. ‘নিশীথে’ অর্থ কী?
উ: গভীর রাত।
52. গল্পের মূল বিষয় কী?
উ: অপরাধবোধ।
53. গল্পের চরিত্র কিসে ভোগে?
উ: মানসিক আতঙ্কে।
54. ভয়ের উৎস কী?
উ: বিবেক।
55. গল্পটি কোন ধারার?
উ: মনস্তাত্ত্বিক।
56. রাত এখানে কীসের প্রতীক?
উ: অবচেতন মন।
57. গল্পে শাস্তি কেমন?
উ: মানসিক।
58. বাহ্যিক অপরাধ আছে কি?
উ: নেই।
59. গল্পের আবহ কেমন?
উ: নিস্তব্ধ।
60. গল্পের মূল শিক্ষা কী?
উ: বিবেকের বিচার।

---

৭. এক রাত্রি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১০টি)

61. গল্পের সময়কাল কত?
উ: এক রাত।
62. গল্পের মূল বিষয় কী?
উ: আত্মোপলব্ধি।
63. প্রধান দ্বন্দ্ব কী?
উ: নৈতিক দ্বন্দ্ব।
64. রাত এখানে কী বোঝায়?
উ: সংকটকাল।
65. গল্পটি কোন ধরনের?
উ: মনস্তাত্ত্বিক।
66. চরিত্রটি কিসে ভোগে?
উ: অপরাধবোধে।
67. সামাজিক শাস্তি আছে কি?
উ: নেই।
68. গল্পের পরিণতি কেমন?
উ: আত্মজাগরণ।
69. গল্পে আত্মসমালোচনা কোথায়?
উ: চরিত্রের মনে।
70. গল্পের শিক্ষা কী?
উ: বিবেক সর্বশ্রেষ্ঠ।

---

৮. শুভা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১০টি)

71. শুভা কেমন মেয়ে?
উ: বোবা।
72. শুভা কথা বলতে পারে না কেন?
উ: জন্মগত প্রতিবন্ধকতা।
73. শুভার প্রধান ভাষা কী?
উ: নীরবতা।
74. শুভার সঙ্গী কে?
উ: প্রকৃতি।
75. গল্পের মূল বিষয় কী?
উ: মানবিক ব্যর্থতা।
76. শুভার বিয়ে কেমন হয়?
উ: প্রতারণামূলক।

77. সমাজ শুভাকে কীভাবে দেখে?
উ: বোঝা হিসেবে।
78. গল্পটি কোন ধারার?
উ: মানবতাবাদী।
79. শুভার যন্ত্রণা কেমন?
উ: নীরব।
80. গল্পের শিক্ষা কী?
উ: সহানুভূতির প্রয়োজন।

---

৯. অতিথি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১০টি)

81. গল্পের প্রধান চরিত্র কে?
উ: তারাপদ।
82. তারাপদের স্বভাব কেমন?
উ: চঞ্চল।
83. মতিলালবাবু কে?
উ: অভিভাবক।
84. তারাপদ কোথায় থাকতে চায় না?
উ: স্থায়ী ঘরে।
85. গল্পের মূল বিষয় কী?
উ: স্বাধীনতা।
86. তারাপদ কেন চলে যায়?
উ: বাঁধন অপছন্দের জন্য।
87. ‘অতিথি’ শব্দের অর্থ কী?
উ: অস্থায়ী মানুষ।
88. গল্পের প্রকৃতি কেমন?
উ: দার্শনিক।
89. তারাপদের জীবনদর্শন কী?
উ: মুক্ত পথ।
90. গল্পের বার্তা কী?
উ: স্বাধীনতা সর্বোচ্চ।

---

১০. ল্যাবরেটরি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১০টি)

91. গল্পের প্রধান চরিত্র কে?
উ: সোহিনী।

92. সোহিনী কোন পেশার সঙ্গে যুক্ত?
উ: বিজ্ঞান।
93. গল্পের প্রধান দ্বন্দ্ব কী?
উ: বিজ্ঞান বনাম আবেগ।
94. ল্যাবরেটরি কীসের প্রতীক?
উ: নৈতিক পরীক্ষা।
95. সোহিনী কেমন নারী?
উ: দৃঢ়চরিত্র।
96. গল্পে মাতৃত্বের ভূমিকা কী?
উ: নৈতিক সংকট।
97. গল্পটি কোন ধারার?
উ: আধুনিক।
98. সোহিনীর সিদ্ধান্ত কেমন?
উ: কঠোর।
99. গল্পের মূল বার্তা কী?
উ: মানবকল্যাণ।
100. ল্যাবরেটরি গল্পে কী প্রাধান্য পেয়েছে?
উ: নৈতিক সাহস।